৩০

শিক্ষা ও জাতীয় সংহতি
| Education and National Integration |

মানুষ প্রায় সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই দলবদ্ধভাবে বাস করছে। দলবদ্ধভাবে বাস করার প্রবণতা তার অন্তর্নিহিত। কিন্তু সমাজবিকাশের ইতিহাস বা মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, তার সবটাই পারস্পরিক হৃদ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে, মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই মানবসভ্যতার ইতিহাস এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বর্তমান, তেমনি একই সমাজের মধ্যে ও বিভিন্ন মানুষের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই সমস্যা বর্তমানে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে। সেখানে বিভিন্ন জাতি, তাদের বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও একই রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনাধীনে বাস করছে। এই সকল রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা স্থাপনের সমস্যা রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। ভারত স্বাধীনতা লাভের পর নিজেকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং একটি সংবিধানের দ্বারা বিভিন্ন অংশের মানুষকে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু মনের দিক থেকে কি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে? তবে, ভাষার জন্য আন্দোলন কেন? ধর্মের জন্য আন্দোলন কেন? রাজ্যের সীমা নিয়ে আন্দোলন কেন? এমনকি, নদীর জলের ভাগ নিয়েই বা বিভেদ কেন? এই সবের প্রভাব কেন ভয়াবহভাবে সমাজজীবনে দেখা দেয়?

এই জাতীয় সমস্যাবলির সমাধানের জন্য প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত মানবীয় পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিকে পুনর্বিবেচনা করে দেখা দরকার। মুক্ত মন নিয়ে জাতীয় সংহতির সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে তার মূল্যায়ন করতে হবে। তা যদি না করতে পারা যায়, তাহলে জাতির ভিত্তি ভেঙে যাবে। শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় সংহতি আনা যাবে না। মনের সংহতি বা জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার সংহতি আনতে হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন—"Political integration has already taken place, but what I am after is something much deeper than that an emotional integration of the Indian people so that we may be welded into one strong national unit maintaining at the same time all our wonderful diversity।" ভারতের বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সংকীর্ণ ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনাকে অতিক্রম করে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহানুভূতি গড়ে তুলতে পারবে, তখনই জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধান হবে এবং প্রক্ষোভিক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ **ভৌগোলিক সীমা ও উপজাতীয় আনুগত্যকে অস্বীকার করে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগরিত হওয়াকে বলা হচ্ছে জাতীয় সংহতি** (National integration)।

ভারতে জাতীয় সংহতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান কালে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দুটি দিক থেকে। বর্তমানে বিশ্বসভ্যতার দ্বিমুখী প্রবণতা প্রত্যেক রাষ্ট্রকে জাতীয় সংহতির সমস্যার সমাধান দ্রুত খুঁজতে বাধ্য করেছে। এদের মধ্যে একটি হল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের প্রবণতা। এই বিরোধের মোকাবিলা করার জন্য দরকার জাতীয়তাবাদের (Nationalism) আদর্শ। দেশের প্রত্যেক মানুষ যদি একত্রে মিলেমিশে বাস করতে না শেখে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারা যাবে না। তাই মানবসভ্যতার এই বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্রের অন্তর্গত সব শক্তির মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে আরও ব্যাপক করার শক্তি দিচ্ছে। এও প্রায় অতীত যুগ। বর্তমান কালে প্রত্যেক চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ মনে করেন, মানবসভ্যতার আরও অগ্রগতির জন্য চাই বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। তাই যে যুগে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যে যুগে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রিক সংহতি আনার প্রচেষ্টা চলেছে, সে যুগে জাতীয় সংহতিকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, সংহতি বা সমন্বয়ের প্রক্রিয়া তার স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমপর্যায়ে অগ্রসর হয়। প্রথম ক্ষুদ্রতম অংশগুলির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক বৃহত্তর সংগঠন তৈরি হয়, তারপর ওই অংশগুলি পরস্পরের মধ্যে সংহতিস্থাপনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলে। এই ভাবেই অগ্রসর হয় সংহতির প্রক্রিয়া (Process of integration)। তাই আধুনিকযুগে যখন অন্তঃরাষ্ট্রীয় সংহতির কথা বলা হচ্ছে, তখন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক সংহতি স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতের জাতীয় অসংহতির কারণ
Factors of disintegration in India

বর্তমান ভারতের অসংহতি নানা কারণে দেখা দিচ্ছে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন—

এক ভারতবর্ষে বহু ধর্মের মানুষ বাস করে; প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে নাগরিকগণ পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে এবং তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভয়াবহভাবে বিভিন্ন আচরণের মধ্যে। এই ধরনের মনোভাবের ফলেই স্বাধীনতার মুহূর্তে ভারতবর্ষকে ভাগ করার প্রয়োজন হয়েছিল। ধর্মের প্রতি গোঁড়া মনোভাব এবং অন্ধ বিশ্বাস এই ধরনের অসংহতির জন্য দায়ী। স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরে, আজও দেশের জনগণ ধর্মের দোহাই দিয়ে অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজে লিপ্ত হয়।

দুই আবার, একই ধর্মীয় মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন বিভাগ বা উপশ্রেণি (Sub-class বা Caste) আছে। হিন্দুধর্মে বর্ণ ভেদের প্রথা আছে। এই প্রথা ভারতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনো বিশেষ বর্ণের লোকের সামাজিক অনুষ্ঠানে অন্য বর্ণের লোকের প্রবেশ নিষেধ। এই ধরনের সামাজিক প্রথা পরস্পরের মধ্যে বিভেদমূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

তিন ভাষা আর এক ধরনের অসংহতিমূলক উপাদান। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ সাংকেতিকভাবে (Symbolically) তার মনের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ আছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষের ভাষা বোঝে না। ফলে ভাবের আদান-প্রদান ঠিকভাবে হয় না এবং এই কারণে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় না। যদিও হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে সমস্যা সমাধানের তুলনায় সমস্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

চার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার (Economic insecurity) অভাব এবং জাতীয় আয়ের বিষম বণ্টন, বেকার সমস্যা, এই সমস্ত কিছু ভারতের বর্তমান যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে। এর ফলে তারা জীবনপরিস্থিতির সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। এটিও অসংহতির একটা প্রধান কারণ। বেকার যুবক ও অনুন্নত শ্রেণির ব্যক্তিদের মানসিক ক্ষোভ ভয়াবহ আকারে আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। আর এইসব আচরণের মাধ্যমে তারা তাদের মানসিক চাপকে হ্রাস করে সাময়িক তৃপ্তি লাভ করছে। কিন্তু ফলস্বরূপ থেকে যাচ্ছে অসন্তোষ।

পাঁচ যথাযথ নেতৃত্বের অভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্য (State) পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করছে না। এই ধরনের সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য আন্তঃরাজ্য বিরোধ দেখা দিচ্ছে এবং সেই বিরোধে সাধারণ নাগরিকগণ হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। এই ধরনের উগ্র প্রাদেশিকতা জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ছয় সামগ্রিকভাবে জাতির নৈতিকমানের অবনতি জাতীয় সংহতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব, পরস্পরকে প্রতারণা করার মনোভাব, অসদুপায়ে অর্থ অর্জনের চেষ্টা—এ সমস্ত কিছু এই নৈতিকমানের অবনতির ফল এবং এর ফলে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব সবসময় জাগরূক থাকছে। নৈতিক মান

সাত সবশেষে, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, নিরক্ষরতা এই জাতীয় সংহতি স্থাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার দ্বারা যথার্থ নাগরিকতার শিক্ষা হচ্ছে না, ফলে সুস্থ নাগরিক জীবনের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার, তা শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না। নিরক্ষরতা

জাতীয় জীবনের এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে না পারলে, জাতীয় সংহতির সমস্যা চিরদিনই থেকে যাবে। তাই জাতীয় সংহতির সমস্যাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমাধান করতে হলে এই সমস্যাগুলি সার্থক সমাধানের মাধ্যমেই অগ্রসর হতে হবে। সার্বভৌম শাসনক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন করলে এবং বিভিন্ন জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে কতকগুলি আইন গঠন করলেই অসংগতিকে দূর করা যাবে না। গতানুগতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন করতে হবে মনোবিজ্ঞানসম্মতভাবে। উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক নাগরিকের জীবনে প্রক্ষোভমূলক ভারসাম্য (Emotional balance) যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই জাতীয় সংহতি স্থাপন করার কাজ সঠিক পথে অগ্রসর হবে। মন্তব্য

জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা
National Integration and Education

শিক্ষাই একমাত্র উন্নত ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। জাতীয় সংহতির যেসব বাধা আছে, সেগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার প্রত্যেকটির মূলে আছে শিক্ষার অভাবজনিত অজ্ঞতা। ধর্মীয় বিরোধের মূলে আছে ধর্মের মূল সূত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। বর্ণাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থায় আস্থার মূলেও আছে উদারনৈতিক শিক্ষার অভাব। উগ্র প্রাদেশিকতার মূলেও আছে অশিক্ষা বা কু-শিক্ষার প্রভাব। ব্যক্তির নৈতিকমানের অবনতির মূল কারণ হল প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে না পারা। সুতরাং, প্রায় প্রত্যেকটি কারণ একই দিকে নির্দেশিত। অর্থাৎ, শিক্ষার অভাবের জন্যই এই ধরনের বৈশিষ্ট্য জাতির জীবনে দেখা দিয়েছে। সুতরাং জাতীয় সংহতির সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিক্ষার দ্বারা যদি ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী পরিবর্তন না আনা যায়, শিক্ষার দ্বারা যদি ব্যক্তির নৈতিক মানের উন্নতি না করা যায়, তাহলে জাতীয় সংহতির সমস্যা কোনো দিনই স্থায়ীভাবে সমাধান করা যাবে না। জাতীয় অসংহতির কারণ ও শিক্ষা

আবার অন্য এক দিকে বিচার করলেও শিক্ষার উপর জাতীয় সংহতি স্থাপনের দায়িত্ব এসে পড়ে। শিক্ষা হল এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। তার দ্বারা সমাজের প্রয়োজনও সাধিত হবে। এখন বর্তমান সমাজের (ভারতীয়) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন যদি হয় জাতীয় সংহতি স্থাপন করা, তাহলে শিক্ষাকে স্বাভাবিকভাবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে. এল. শ্রীমালী (Srimali) বলেছেন—"If we are convinced that in the present state of our development, we must make a deliberate effort to develop national consciousness among our people, it is a legitimate demand that our educational system should be geared to fulfil this purpose...Education must make the growing youth realize that they are indisolubly bound to the nation and its destiny, its tragedies and joys, its conflicts and settlements, its failures and achievements, its mistakes and wisdoms and they should come to regard it with pride and with love and the impelling desire to serve it whole-heartedly." জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা

মন্তব্য

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় সংহতির সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই গুরুত্বে কথা ভারতের প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদ্ উপলব্ধি করেছেন। 1958 সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনাচক্রে ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ যোগ দেন। সেখানে তাঁরা প্রত্যেকে জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। যদিও তাঁদের আলোচনা বিশেষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, তবুও তা সাধারণভাবে সর্বস্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরে এই আলোচনা চক্রের ফলাফলকে কার্যকর করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষাকে কীভাবে পরিচালনা করা যায়, সে সম্পর্কে সুপারিশ করেন। তাঁদের এই সুপারিশগুলি উল্লেখ করলে জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার পথ নির্ধারণ করা যাবে।

জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষার পুনর্বিন্যাস
Reorganisation of Education for National Integration

জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে হলে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার দরকার, এবং সম্পূর্ণ শিক্ষাকে ওই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত আলোচনা চক্রে যে পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

[এক] জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে এবং এই ধরনের বৈষম্য দূর করে প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ দিতে হলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে যাতে জীবনউপযোগী প্রশিক্ষণ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারে তার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে। শিক্ষার্থীগণ যাতে এই স্তরে নির্দিষ্ট বৃত্তিমূলক প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে দিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ইতিহাসের মূল্যায়ন

[দুই] প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে ঐক্যের উপাদানকে বড়ো করে তুলে ধরার জন্য ইতিহাসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ গতানুগতিক ইতিহাসশিক্ষার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। ইতিহাস যাতে শিক্ষার্থীদের সামনে মানুষের সামাজিক বিবর্তনের অন্তর্নিহিত ঐক্যটি ফুটিয়ে তুলতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ইতিহাসের (Political history) উপর গুরুত্ব হ্রাস করে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের (Social & Political history) উপর গুরুত্ব দিতে হবে। ইতিহাসে যাতে শিক্ষার্থীদের সামনে ভারতীয় সমাজের বিবর্তন ও বৈচিত্র্যের মধ্যেকার মূল ঐক্যের সূত্রটি তুলে ধরতে পারে, সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

অন্য ভাষার পরিচিতি

[তিন] ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সুপরিকল্পিতভাবে বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষালয়ে যাতে বিভিন্ন ভাষার ভালো বইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীগণ পরিচিত হতে পারে, তার জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাজ্যে অন্য রাজ্যের ভাষা পঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ হবে এবং অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন অনেক সময় যে ভুল বোঝাবুঝি হয়, তা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হবে। পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীগণ যাতে মাতৃভাষা ও ইংরাজির সঙ্গে অন্তত অন্য যে-কোনো একটি ভারতীয় ভাষা শিখতে পারে, তার ব্যবস্থা করলে, জাতীয় সংহতি স্থাপনের পথ সুগম হয়।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন

[চার] বিভিন্ন রাজ্যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময় বিশেষ যত্ন নিতে হবে। যে সকল পুস্তকের বিষয়বস্তু জাতীয় সংহতি স্থাপনের উপযোগী মানসিকতা গঠনে সহায়তা করবে সেই জাতীয় পুস্তক নির্বাচন করতে হবে। যদি কোনো বিশেষ পুস্তক কোনো বিশেষ অঞ্চলের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিদ্বেষ সমালোচনা করে, তাহলে সেই পুস্তক সব সময় ত্যাগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এই জাতীয় পুস্তকের উপর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। বিশেষভাবে, ভাষা ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময় এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। এই সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক এমন

ব্যাপারে যদি সরকার একটি সর্বভারতীয় নীতি ঘোষণা করেন, তাহলে ভালো হয়। বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (National Council of Educational Research and Training; N.C.E.R.T.) বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক রচনা করেছেন। এগুলিকে আদর্শ হিসাবে ধরে, বেসরকারি স্তরে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও নির্বাচন করতে পারলে ভালো হয়।

[পাঁচ] বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণকে সহজ করতে হবে। এই ব্যবস্থার ফলে ভিন্নভাষীদের পক্ষে যে-কোনো ভাষা শেখা সহজ হবে। ভাষাসংক্রান্ত নিয়মকানুনের গোঁড়ামি ভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তিদের পক্ষে কোনো ভাষা সহজে আয়ত্ত করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নিযুক্ত কমিটি বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণের সহজীকরণের সুপারিশ করেছেন। — ভাষায় ব্যাকরণের সরলীকরণ

[ছয়] জাতীয় সংহতি স্থাপনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে এবং শিক্ষার্থীগণ সেগুলি যাতে সহজে সংগ্রহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ধরনের পাঠ্যপুস্তকে মানুষের ঐকাবদ্ধ প্রচেষ্টার বিভিন্ন কাহিনি থাকবে। জাতীয় অসংহতির পরিচায়ক মানুষের বর্তমান আচরণগুলির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও থাকবে এই পাঠ্যপুস্তকে। এক কথায়, এই পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থীদের সংহতির উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। জাতীয় পুস্তক পর্ষৎ (National Book Trust) এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু কাজ করছে। আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত কিছু কিছু পুস্তক তাঁরা অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। তবে এইসব পুস্তকের প্রচার যাতে বাড়ে, সেদিকে তাঁদের আরও নজর দিতে হবে। — পাঠ্যপুস্তক রচনা

[সাত] শিক্ষালয়ের মাধ্যমে গণশিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে করে অশিক্ষিত বয়স্কদের সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কোনো বিভেদের মনোভাব সৃষ্টি না হয়। শিক্ষালয় থেকে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকগণ যদি সপ্তাহে একদিন করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে জনসংযোগ করেন এবং সাধারণ বিষয়ের উপর বক্তৃতার আয়োজন করেন, তার ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাও অনেকাংশে দূর হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপিত হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমে, সমাজসেবামূলক কাজকে আবশ্যিক করা হয়েছে। এই পাঠক্রম সঠিকভাবে অনুসরণ করলে জাতীয় সংহতি স্থাপনের কাজে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাবে, এ আশা পোষণ করা যেতে পারে। — গণশিক্ষা

[আট] বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস (National Day) পালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত হবে। বিভিন্ন জাতীয় নেতার জন্ম দিবস পালন এবং বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক উৎসব ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে এবং তার ফলে জাতীয় অসংহতি দূর করা যায়। — জাতীয় দিবস পালন

[নয়] সিনেমা, রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিকারী অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে হবে যাতে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে। এই সুপারিশকে কার্যকর করার জন্য ভারত সরকার নানা ব্যবস্থা করেছেন। প্রতি বছর সর্বোৎকৃষ্ট জাতীয় সংহতিমূলক চলচ্চিত্র প্রস্তুতকারককে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া, আকাশবাণী থেকে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব কর্মসূচির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জাতীয় অনুষ্ঠান (National Programme) ও যুগবাণী অনুষ্ঠান। আশা করা যায়, এই সকল ব্যবস্থা দেশের নাগরিকদের চিন্তা জগতে স্থায়ী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে। — জনসংযোগ ব্যবস্থা

[দশ] বিদ্যালয়ের আচরণই পরবর্তী পর্যায়ে সমাজজীবনে সঞ্চারিত হবে। সুতরাং বিদ্যালয়জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে চলতে হবে এবং ধর্মভেদের নীতিকে বিদ্যালয়ের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এই ধরনের ব্যবস্থা সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করলে শৈশবকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে একথা স্মরণ রাখার দরকার, ধর্মীয় মনোভাব প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে জন্মের পর থেকে সামাজিক প্রভাবে সঞ্চারিত হয়। ধর্মই ভারতীয় সমাজের ভিত্তি, তাই তাকে শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা যায় না। তাই শিক্ষাকে জাতীয় সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হলে, বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক — ধর্মের গোঁড়ামি ত্যাগ

শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে, সেই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যাতে ধর্মের গোঁড়ামি শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চারিত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব

[এগারো] সবশেষে, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জাতীয় সংহতি স্থাপনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাতে সমস্ত রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে, সেই মনোভাবের অধিকারী করে তাদের গড়ে তুলতে হবে। উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থাই শিক্ষিত মানুষের মনের সংকীর্ণতাকে দূর করতে পারে।

আলোচনা

দলগত আনুগত্য এবং জাতীয় সংহতি ও প্রক্ষোভিক সংহতি স্থাপনের সমস্যা ভারতের একার সমস্যা নয়। পৃথিবীর যে-কোনো রাষ্ট্রেই দলগত বা উপজাতিগত শ্রেণিবিভাগ বর্তমান। আর এই দলগত বিভাগ-এর কোনো শেষ সীমা নেই। এর ক্ষুদ্রতম একক যে কী, তা সঠিক করে বলা মুশকিল। কারণ দলকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়। তবে বৃহৎ বহু কৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা তীব্র—যেমন, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করলে লক্ষ করা যায়, আবহমানকাল ধরে ভারতীয় সমাজ তার বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য বজায় রেখেছে। অধ্যাপক হুমায়ন কবির ভারতীয় কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"Inspite of these marked divergencies, there is equally little doubt that for at least 2000 years or more, there has been a general feeling of Indianness which has transcended all these distinctions and made the many Indian communities one Indian people" ভারতবর্ষের সকল মানুষ কোনোদিনই এক ভাষায় কথা বলেনি, কোনোদিন একই ধর্ম অনুসরণ করেনি, কোনোদিন ভারতের সমগ্র ভূখণ্ডের উপর একজন রাজা রাজত্ব করেননি ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়ার সমতা দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথও ভারত-সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষে চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে, অন্তরে উপলব্ধি করা; বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও, বর্তমানে, ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা যে নেই সেকথা বললে সত্যের অবমাননা করা হবে। তাই জাতীয় সংহতির সমস্যাকে স্থায়ীভাবে সমাধান করতে হলে মানসিক বা বৌদ্ধিক পর্যায়ে তার সমাধান করতে হবে। শুধুমাত্র প্রক্ষোভমূলক সংহতির মাধ্যমে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যদি জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পারা না যায়, তাহলে অসংগতির সমস্যা চিরদিন থেকে যাবে। তাই এই ধরনের বৌদ্ধিক পর্যায়ে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করার প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষাকে এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য নতুনভাবে সাজাতে হবে।

প্রশ্নাবলি

1. Discuss the role of Education in National Integration.
2. What steps do you suggest for the organisation of education for national integration ?
3. Write a brief essay on Education for India's National Integration.
4. **Write notes on :**
   (a) Causes of disintegration in India.
   (b) Education for National integration.